ওপাড়ে মোহন বাঁশি বাজছে ... ...

১)

ঘামে ভিজে কালো ব্লাউজটার পিঠটা জব্‌-জবে । সাদা থান শাড়িটার আঁচল টেনে পিঠটা ঢেকে নিল রাণু । কানের দু'পাশ থেকে গলা বেয়ে ঘামের শাখা-নদী বয়ে চলেছে ব্লাউজের গভীরে । এ ধরনের গরমে ঘামে ভেজার অনুভূতিতে রাণু আলাদা এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি লাভ করে । তার কাছে মনে হয় ঘাম তার দেহে স্ব-মেহনের সুখ-লীলা করছে । স্পর্শের আর বিশেষ কোন স্মৃতি তার মনে পড়েনা । কাঠের বাট এর ক্লীপ চাপ দিয়ে বড় কালো ছাতাটার নীচে ছায়া নিল সে । হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রাখা কাগজগুলো ততক্ষণে ঘামে ভিজে খুব খারাপ অবস্থা ।

গেইটের কাছে পৌছার আগেই স্যান্ডেলের এক পাটি গেল ছিঁড়ে । এই দুঃসময়ে আবার একজোড়া নতুন স্যান্ডেল কিনতে কমপক্ষে ১২০ টাকা ব্যায়ের চিন্তায় মেঘ-ভ্রু কুঁচকালো রাণু । হাতে স্যান্ডেল নিতেও অসুবিধা হচ্ছিল । কারন এক হাতে ছাতার বাট ধরা ; অন্য হাতে একগাদা কাগজ । পা ছেঁচড়ে - ছেঁচড়ে কোনমতে বাসার কাঠের গেইটটা পাড় হয়ে উঠোণে দাঁড়ালো এসে । উঠোণ থেকে নিজের ঘরে ঢুকার আর শক্তি পেলনা । কাগজ আর ছেঁড়া স্যান্ডেলের পাটি দু'টো উঠোণে নামিয়ে রেখেই ধপাস্‌ করে বসে পড়লো মাঝ উঠোণে । মাথার উপড় মেঘের ছায়া দেখতে পেলো যেন । 'বং ' 'বাং ' ধরনের কিছু শব্দ কানে এলো । একসময় সে আর কোনও শব্দই শুনতে পেলনা । চোখে ও ভাসছিলনা কোন দৃশ্য ।

২)

অয়েল-ক্লথের কোণটা কানের কাছে থেকে-থেকে খোঁচাচ্ছে । পানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন রাণু । একবার ডান কানের ভেতর একটু পানি ঢুকে আবার বেয়ে নিচে পড়ে গেল ভরা বালতি থেকে এলুমিনিয়ামের মগ দিয়ে ঠান্ডা পানি মাথায় ঢালছে রিক্তা । রাণুর মাথার চুলে বার কয়েক বিলি কেটে পানি প্রবেশের জন্য ফাঁক করে দিয়ে রিক্তা খুব কোমল স্বরে ডাকলো ,

' মা . . . চোখ মেলোতো একটু ! '

এবার কাগজীলেবুর ঘ্রাণ স্পষ্ট হ'লো রাণুর ঘ্রাণেন্দ্রীয়ে । কাগজীলেবুর এ গাছটা তার নিজ হাতে লাগানো । রিক্তা পেটে থাকাকালীন রাণুর খুব বমি হ'তো । লেবু ধরার মত বড় হয়ে উঠেনি তখনও গাছটা , কিন্তু এর পাতাগুলো রগড়ে নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ শুকলে বেশ ভাল লাগতো তার । আর অভাবের সংসার , বাসায় কোনো মেহমান এলে আর কিছু দিতে না পারুক ; অন্ত:ত এক গ্লাস লেবুর শরবৎ দিয়ে তো আপ্যায়ণ করতে পেরেছে সে । মনে পড়ে , এই কাগজীলেবু গাছটায় বিকেলে রাণু যখন পানি দিত তখন পিতলের বদনার নল দিয়ে পানি যে গতিতে ঐ গাছের গোড়ায় ঢালতো সেই একই গতিতে দু'চোখ বেয়ে ঝরতো তার দু'চোখের নোনা জল । এ গাছটা রাণুর দু:খের মাঝে নিরব সান্ত্বনা , যেন খুব ভাল বন্ধুর মত পরম আশ্রয় , যার কাছে মনের সব গোপন কথা গচ্ছিত রাখা যায় , সে কথা কখনও কারো কাছে ফাঁস করে দেয়না ।

শরবৎ-এ চুমুক দিতেই রাণু বুঝলো চিনি কম হয়েছে । আর টিনের ডিব্বার তলানীর মরচের উৎকট গন্ধটা নাকে যেতেই রাণু ওয়াক্ করে ফেলে দিলো শরবৎটুকু ।

‘ কি হলো মা . . ; শরবৎটা ভাল লাগেনি ? ’

রাণুর মুখের সামনে থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিতে নিতে বল্ল রিক্তা । মৃদু মাথা নেড়ে রাণু শুধু বুঝালো - না , শরবত টা তার ভাল লাগেনি ।

জীবিকার প্রয়োজনে রাণুকে বেশ সময় ঘরের বাইরেই কাটাতে হয় । মেয়েটার বিয়ের বয়স পাড় হ’তে চল্ল , কিন্তু সাংসারিক জ্ঞানের অনেক অভাব নিয়েই বেড়ে উঠছে মেয়েটা । দুধের পুরনো খালি ডিব্বায় চিনি রেখেছিল রিক্তা ; যার তলটা নোনা ধরে মরচে পড়ে গেছে । চিনির পরিমান শেষ পর্যায়ে এলে ; তলানীর চিনিটুকুনে মরচের গন্ধটা বেশ প্রকট হয়ে উঠে , চিনির রঙ টা-ও বদলে হয়ে যায় লালচে মতন , আর সে চিনি দিয়ে বানানো চায়ের রঙ টা দেখায় কালচে খয়েরী বর্ণ ।

৩)

রাতে কাঁথা সেলাই এর সময় সুঁচে সুতো পড়াতে পারছিলনা রাণু । বার-বার সুতোর নালটা সুঁচের পাশ ঘেষে ফস্‌কে যাচ্ছিল । দাঁতের সাথে ঠোঁটের চাপে চাহ্ ! শব্দ তুলে কাঁথাটা বিছানার এক পাশে রেখে রিক্তাকে ডাকতে রান্নাঘরের দিকে এগুলো ।

কুপি জ্বালিয়ে রান্নাঘরে মাটির চুলায় ভাত চড়িয়েছে রিক্তা । ভাতের ফেণ উথ্‌লে পাশ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে ; খেয়াল নেই সে’দিকে । ও বাঁশের মোড়াটায় বসে মন দিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখায় ব্যস্ত । রিক্তাকে দেখে মায়া লাগলো রাণুর । আহারে ! তার মেয়েটার পড়াশুনায় কত আগ্রহ । সংসারের কাজের চাপ কম দিলে হয়তো বোর্ডে স্ট্যান্ড করতে পারতো রিক্তা । এমনিতেও রেজাল্ট ভালই করেছে । এস.এস.সি , এইচ.এস.সি তে কলা বিভাগ থেকে ষ্টার মার্কস পেয়ে কিশোরগঞ্জ সরকারী গুরুদয়াল কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে সন্মান ও স্নাতোকোত্তর পাশ করে বি.সি.এস - শিক্ষা ক্যাডারে প্রথমে কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজে এবং পরে বদলী হয়ে সরকারী গুরুদয়াল কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাষিকা পদে নিয়োগ পেয়েছে অদিতি রহমান (রিক্তা) ।

৪)

- মা কাল সমিতিতে না গেলে হয় না ?

- না-রে, না গেলেই যে না । এই কাঁথাটার নকশীফোঁড়ের ডিজাইন মিনহাজ সাহেবের পছন্দ হয়েছে । উনি এটার ব্যাপারে আশাবাদী । এই প্রথম আমার কাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে । কাল বিকেলে মিনহাজ সাহেবের সাথে আমাদের সমিতির সদস্যদের জরুরী মিটিং আছে । ওতে এই কাঁথাটা দেখাতে হবে । দে - তো রিক্তা ; সুঁচে সুতোটা পড়িয়ে । চোখে আজকাল কম দেখছি বলে মনে হচ্ছে ।

পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই রাণুর দীর্ঘশ্বাসে মেয়ে রিক্তা ঘুরে দাঁড়ালো মায়ের দিকে ।

- মা , আমার চাকরি তো পাকাপোক্ত এখন । তুমি না হয় চাকরি আর না-ই করলে । সমিতির কাজটা ছেড়ে দিলেও তো পারো মা . . ।

- নাহ্ , যদ্দিন চলতে ফিরতে পারছি ; সমিতির কাজটা চালিয়ে যেতে চাই । নতুন সদস্যরা আমাদের কাছ থেকে কাজ শিখছে । এ যে আমার কতো ভাল লাগে !

- তা বুঝি মা , কিন্তু নিজের শরীরটাও তো দেখা দরকার তোমার । আমি থাকি কলেজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত । তোমাকে সেবার সময় আর কোথায় পাই বলো ?

রাণু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে তার মেয়েটিকে । মায়ের জন্য কত ভালবাসা মেয়েটার । এমন-টি ক'জনার ভাগ্যে মেলে ? মায়ের আদর , স্বামী সংসার জোটেনি রাণুর । তা-তে কি ? মেয়ে তার জীবনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে । পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা লাঞ্ছিতা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা রাণুর গর্ভে এসেছিল রিক্তা । কে তার পিতা , ঠিক ঠাহর করতে পারেনি রাণু । আর সেই নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারের স্মৃতি-ই রাণুর নারী অস্তিত্বে পুরুষ সঙ্গ লাভের এক মাত্র স্মৃতি ; যা মনে পড়লে আজও শিউড়ে উঠে তার মন , নিজ দেহটাকে তার নিজের কাছে মনে হয় বধ্যভূমীর পচা গলা লাশ । তার পর-ও ভেঙে পড়েনি রাণু । শৈশবে নিজ মা'কে হারিয়েছে বটে , কিন্তু মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'তে ইচ্ছে হয়নি তার ; তাই শত্রুর ঔরসজাত সন্তানকেই মাতৃত্বের মায়ায় লালন করেছে রাণু আপন গর্ভে । এক-দুই করে পাড় করেছে ন'টি মাস । নির্যাতন শেষে হানাদারেরা রাণুকে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় রেল লাইনের উপড় ফেলে গেলেও গড়িয়ে সে চলে আসে রেল-লাইনের পাশের মাটির রাস্তায় । তারপর কুঁড়িয়ে পাওয়া এক টুকরো আয়নার টুকরোয় ঘষে কেটে ফেলে তার হাতের দড়ির বাঁধন । মুক্ত হাত দু'টো দিয়ে খুলে ফেলে তার মুখে বাঁধা ওড়ণা । এভাবে নেত্রকোনার মেয়ে রাণু নিজের প্রান বাঁচিয়ে ট্রেনে চেপে এসে পৌঁছে কিশোরগঞ্জ শহরে ।

কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনের চায়ের দোকানী বিনোদ । ষ্টেশনে ইত:স্তত ঘুরতে থাকা রাণুর কাছে এগিয়ে গিয়েছিল স্বেচ্ছায় । অসুস্থ রাণুকে নিয়ে প্রথমে গিয়েছিল ওখানকার মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তার পর একসময় আশ্রয়ের ব্যবস্হা করে দিল বিনোদের বিধবা নি:সন্তান বোন অনিমার কাছে ১৫ বছর বয়সী রাণুর সেই থেকে শুরু জীবন-সংগ্রাম । আজ অব্দী কোনও পুরুষের ঘর করেনি সে । মাথা নত করেনি কোনও পুরুষের লালসার কাছে , বরং বুদ্ধিমত্তার সাথে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাথী হয়ে কাজ করে গেছে সমাজে মানুষের কল্যাণে । ধর্ষিতা যে মেয়েটি জন্ম দিয়েছে পাকিস্তানী হানাদার কোন এক সৈন্য-র ঔরসজাত শিশু কন্যা ; তার ব্যক্তিত্ব আর সুকর্মের কারনে সমাজ কখনো তার দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে সাহস করেনি । খরমপট্টি এলাকায় বিনোদের বাড়ীতে তার বিধবা বোনটির আশ্রয়ে ধীরে-ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছিল রাণু । পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী বিনোদের ; যার সেবা , যত্ন-ও তার বোন অনিমাকেই করতে হয় । অনিমা আগলে রেখেছে বিনোদের সংসার আর বিনোদের দুই মেয়ে টুম্পা আর টিনা সহ রাণুকে ।

এভাবে মুসলিম রাণু তার জীবনের সুর বেঁধে নিয়েছিল অচেনা অজানা এক হিন্দু পরিবারের বিণার তারের সুরে । বিনোদ যদ্দিন বেঁচে ছিল তাদের কোন সমস্যা ছিলনা । আর বিনোদের বন্ধু বিয়াস কে ঘিরে রাণুর ছিল নিরব প্রেম । সে'টি রাণু কাউকে বুঝতে না দিলেও বিনোদ বুঝে যেত , তাই হাসি ঠাট্টার সুযোগ করে দিত বিয়াস আর রাণুকে । রাণু ঘরে বসেই অনিমার কাছে শিখে নিলো - হাতের কাজ , সেলাই , সুঁচি-শিল্পকর্ম , নানান রকমের নঁকশী-পিঠা , পাট ও চটের

ব্যাগ , স্যান্ডেল আর ওলের কার্পেট বুনার কাজ । প্রথম-প্রথম ঘরে বসে শখের বশেই বানাতো রাণু । পরে তার শৈল্পিক কারুকাজ দেখে ; প্রতিবেশী বৌ ঝি দের মাঝে রাণুর হাতের কাজের জিনিষের কদর ও প্রসার বেড়ে গেল । এভাবেই গড়ে উঠলো ‘ প্রগতি কুটির শিল্প ও সমিতি ’ । মাত্র ৪ সদস্য নিয়ে শুরু এই সমিতি আজ ৫৩৭ জনের এক বিরাট কারখানা । এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যাদি মিনহাজ সাহেব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতরণ ব্যবস্থায় উদ্যোগ ও নিচ্ছেন খুব শিগ্‌গীর । রাণুর মনে আনন্দ যেন ধরেনা । চোখের কোলটা চিক্‌-চিক করে উঠে তার সুন্দর জীবনের আশ্বাসে ।

৫)

কেন যেন ইদানিং বিয়াসকে মনে পড়ে খুব । মনে হয় এই প্রৌঢ়ার জীবনে বিয়াস যদি আজ পাশে থাকতো ; গল্প আর স্মৃতিচারণে একঘেয়ে জীবনটাতে ছন্দ যোজনা করা যেত বেশ । হঠাৎ করেই বিয়াস বিয়ে করে ফেল্ল শিপ্রা নাম এর এক খৃষ্টান নার্সকে । পুরুষরা বুঝি এমন-ই হয় ? ভাল-ই হয়েছে । রাণুকে আর কোনো পুরুষের সাথে ঘর বাঁধতে হয়নি । পোঁড়া কষ্টের বুকে সইতে হয়নি প্রবঞ্চনার যাতনা । মনের সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কষ্ট সামলে নেয়া বড় কঠিন কাজ । আয়নার কারখানার একজন শ্রমিক হলেও বিয়াসের ছিল শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগ । কাজের ফাঁকে এই বিষয়গুলোতে এক - আধটু ওই বিয়াসের সাথেই আলোচনা হ’তো । বিনোদ আর অনিমার আবার ইত্যেকার বিষয়ে আগ্রহ ছিলোনা তেমন । জীবন সংগ্রামের কঠোর বাস্তবতাকে ঘিরেই ছিল বিনোদ - অনিমা ; এই দু’ভাই বোনের ধ্যান ও শ্রম । ফ্রেমে বাঁধা কাঁথাটায় সুঁচটা গাঁথতে-গাঁথতে বিয়াসের প্রিয় নজরুল গীতির একটি কলি গুন-গুন করে ভাঁজতে লাগলো রাণু ‘ এনেছি আমার শত জনমের প্রেম , আঁখী জলে গাঁথা মালা . . . . ’

৬)

‘৭১ এর যুদ্ধের খন্ড - খন্ড কিছু দৃশ্য ভুলতে পারেনা মঞ্জু । আট বছর বয়সি মঞ্জুর স্মৃতিপটে স্পষ্ট কিছু দৃশ্য তাকে লজ্জিত করে , কুণ্ঠিত করে , বিব্রত হয় তার শাণিত বিবেক । মঞ্জু একজন রাজাকারের সন্তান ! ‘ রাজাকার ’ শব্দটা কারও মুখে শুনলে কিংবা পত্র - পত্রিকার কোথাও লেখাটা দেখলেই চমকে উঠে । শিরা-উপশিরার সমস্ত রক্ত এসে মাথায় চাপ খায় । বুকের হৃদপিন্ডটা পরিণত হয় এক বিশাল হাতুরিতে ; যার প্রচন্ড আঘাতে - আঘাতে মঞ্জুর বুকের পাজর ভেঙে যেতে চায় । বাবা কি করে পারলেন এমন কাজ করতে ! ওহ্‌ বা...বা . . . . যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠে , অস্ফুট চিৎকারে নিরব প্রতিবাদ জানায় মঞ্জু । মনে পড়ে তার প্রতি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা দিদারের ঘৃণার থু-থু আর সেই গা রি-রি করা সংলাপ , ‘ শালা , রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার !!! উবদা কইরা পিডামু তোরে আর তোর বাপেরে . . .’

কিন্ত নাহ্‌ , দিদার পারেনি কখনই তার কাংক্ষিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে । মঞ্জুর বাবা মাহবুব হাসান মাহি বাইন মাছের মত পিচ্ছিল স্বভাবের ; যার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তাকে কিছু বলার আগেই সরে যেতে পারে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে , তা’কে হাতের নাগালে পাওয়া খুব কঠিন এক কাজ । আর মঞ্জুর মনেও রয়েছে আত্মবিশ্বাস - সে রাজাকার নয় , বরং রাজাকারদের সে ঘৃণা করে । ঘৃণা করে মঞ্জু তার নিজ পিতাকেও । কিন্তু এ ঘৃণার সাথে মেশানো থাকে

প্রচন্ড কষ্ট মেশানো অশ্রু-জল । কত দিন বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে চেয়েছে , চেয়েছে জানাতে যে - বাবা , আমি তোমাকে ঘৃণা করি । খুব বেশি ঘৃণা করি আমি তোমাকে । পারেনি । তবে কি রক্তের বাঁধন মানুষকে এতটাই দূর্বল করে দেয় ? দৃঢ়চেতা মঞ্জু তবে কেনো পারছেনা তার বাবার সামনে প্রকাশ করতে তার আ-শৈশব লালিত সেই সত্যকে ?

৭)

নেত্রকোনা উচ্চবিদ্যালয়ের যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক কবির মাষ্টার ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র আর নিরীহ প্রকৃতির মানুষ । বিকেলে বাড়ির পাশের চায়ের দোকানটায় মাঝে-মধ্যে পত্রিকা পড়া ছাড়া তাকে কখনও ঘরের বাইরে যেতে দেখা যায়নি । স্কুল , বাসা আর হাট-বাজার করা ছাড়া বাকি সময়টা রাণুর তদারকিতেই কাটাতেন তিনি । মাত্র ১১ বছর বয়সে মেয়েটা তার মা'কে হারালো এর পর থেকে কবির তার মেয়েটির প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হলেন যেন । বরাবরই মেধাবী ছাত্র মঞ্জু । প্রতিবছর স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে মঞ্জু তার স্কুলের সব শিক্ষকদের বাসায় যেত কদমবুচি করে দোওয়া নেয়ার জন্য । সেই সুবাদে কবির মাষ্টারের বাসায় ও মঞ্জুর যাওয়া হ'তো । এ ছাড়াও স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কাজে কবির মাষ্টারের এর সহযোগিতা নিতেও মঞ্জু-কে রাণুদের বাড়ি মাঝে-মাঝে যেতে হ'তো । একবার একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে মঞ্জু কবিতা আবৃত্তি করলো , সেই একই অনুষ্ঠানে রাণু বু'ও গান গাইলো । রাণু বু'র সাথে একটা কোরাস গান গাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো তার , নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিলো সেদিন । অপূর্ব গানের গলা ছিলো রাণু বু'-র ।

মঞ্জুর মনে পড়ে সেই ভয়াল রাতটির কথা । কবির মাষ্টারকে গুলি করে তার রক্তাক্ত লাশ লাফিয়ে পাড় হয়ে রাণু বু'কে কিভাবে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো পাকিস্তানী সৈণ্যরা । আর তা'দেরকে রাস্তা চেনানোর কাজটি করেছিলেন মঞ্জুর বাবা মাহবুব হাসান মাহি । রাতের অন্ধকারে হারিকেন এর আলোয় বাবার সাথে পাক-সেনাদের ফিস-ফিস কথা-বার্তা আর সেই রাতে তাদের সব কাজ-ই স্ব-চক্ষে দেখেছে মঞ্জু । আট বছর বয়সী মঞ্জুর স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গেছে একটি মহা সত্য । হ্যাঁ , মঞ্জুর বাবা রাজাকার -দেশের কলঙ্ক , সহিংস কীট ; যার সহযোগিতায় তছ-নছ হয়ে গেছে একটি সুন্দর পরিবার , দেশের এক সু-যোগ্য মেধা -কবির মাষ্টার ; যার অনুপ্রেরণা মানুষকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতো । দেশ হারালো রাণু বু 'র মত একজন প্রতিভা ; যে হারালো তার জীবনের স্বাভাবিক গতি । এখানেই শেষ নয় । তাদের পৈশাচিকতার নজীর মুছে ফেলতে রাণু কে নিয়ে ফেলে এসেছে রেল লাইন এর উপর , যেন রাতের আঁধারে ট্রেনের তলায় রাণুর দেহটি পিষ্ট হয়ে ঢেকে যায় তাদের ঘৃণ্য কাজের দলিল । সে কাজেও সহায়তা করেছে মাহবুব মাহি । রাতের অন্ধকারে ওড়নায় বাঁধা মুখ আর পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় তারা ফেলে গেছে রাণু কে রেল লাইনের উপড় । তবে মঞ্জু ঘটনার এতটা জানেনা । সে শুধু জানে রাণুর বাবার সহায়তায় -কবির মাষ্টারের মৃত্যু আর রাণুকে ক্যাম্প-এ ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটুকুন , আর জানে যে এ কাজের বিনিময়ে পাক সেনারা তার বাবাকে দিয়ে গেছে নানান উপঢৌকন । বেশি কিছু না বুঝলেও মঞ্জু এটুকুন বুঝেছে যে স্বাধীনতা যুদ্ধে রাণু বু'র মত অনেক মেয়ের সম্ভ্রমহানী আর অনেক কবির মাষ্টারের জীবন ত্যাগের বিনিময়ে মঞ্জুর বাবার মত লোকেরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে আজ স্বাধীন দেশে সমাজের অধিপতি ; যারা লাল-সবুজ পতাকা উড়ায় 'স্বাধীনতা ' নামের এক প্রহসনের রাজনীতির খেলায় ।

মঞ্জুরা এখন যে বাড়িটিতে আছে সে বাড়িটি একটি পুরোনো হিন্দু জমিদার বাড়ি । জমিদারীর পতন ঘটলেও তার বংশধর থাকছিলো সেখানে পরম্পরায় । যুদ্ধের শুরুতে তারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে চলে গেলে ; পরিত্যাক্ত এ বাড়িটিতেই ক্যাম্প গড়ে তোলে পাকিস্তানী সৈন্যরা , আর যুদ্ধ শেষে এ বাড়ির জবর দখল নেয় মঞ্জুর বাবা মাহবুব হাসান মাহি । এ বাড়িটিকে ঘিরে রাণু বু'র সম্ভ্রমহানীর স্মৃতি তাই মঞ্জু ভুলতে পারেনা কিছুতেই । মঞ্জু তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ -স্ব-দেশের কল্যাণে অপ-শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে । রাজাকারদের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তায় উদ্যমী । রাণুর জন্য কিছু করতে না পারলেও মঞ্জু তার প্রজন্মকে নিজ জীবনের সাথী করে দিতে চায় তার রাণু বু'র প্রতি যথাযোগ্য সন্মান । কিন্তু কোথায় খুঁজে পাবে তার রাণু বু'কে ? . . . .

৮)

নেত্রকোনা থেকে বাবার মাইক্রোবাসে চড়ে মঞ্জু এলো কিশোরগঞ্জের খরমপট্টি এলাকায় । এখানে তার বিশ্ববিদ্যালয় হল জীবনের বন্ধু নিলয় এর বাড়ি । নিলয় জানে মঞ্জুর অনেক ঘটনা । এও জানে যে , মঞ্জু এখানে এসেছে মূলত: পূনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শণ আর সহযোগিতার কাজে । কিশোরগঞ্জ এলাকায় মঞ্জুর কিছু পুরোনো বন্ধু রয়েছে , একই সাথে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে পড়তো তারা । খালেক , সামি , তুহিন এরা সব কেউ জাপান , কেউ ইংল্যান্ড , কেউ নিউজিল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত আর সংসারীও হয়ে গেছে । শুধু ঘর বাঁধা হয়ে উঠেনি ছন্নছাড়া মঞ্জুর জীবনেই । ৪৩ বৎসর বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মঞ্জু যে কার অপেক্ষায় ; ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিলয়-ও তা উদ্ধার করতে পারেনি আজও ।

পূণর্বাসন কেন্দ্রের সূত্র ধরে মঞ্জু জানতে পারলো তার রাণু বু'-র এই গ্রামেই অবস্থানের কথা । জানলো রাণু বু'র প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি কুটির শিল্প ও সমিতি' র নাম আর তার এক মাত্র মেয়ে রিক্তার কথা । রিক্তা এখন গুরুদয়াল সরকারী কলেজের শিক্ষিকা ! দুপুরে ভাত খেতে খেতে খুব আগ্রহের সাথে নিলয়কে মঞ্জু বল্ল , ' দোস্ত -তোদের এলাকায় এসে আমার খুব ভাল লাগছে । গুরুদয়াল কলেজটাও ঘুরে দেখলাম কাল । প্রিন্সিপালকেও ভাল-ই মনে হ'লো কথা বলে । বদলীর চেষ্টা করবো না কি ? নেত্রকোনায়-ই তো কাটিয়ে দিলাম অনেকটা বছর । '

- চেষ্টা করবো মানে ? যত তাড়াতাড়ি পারিস বদলী হয়ে চলে আয় । দেখবি আমরা আবার সেই মোহসিন হলের দিনগুলোর মত আনন্দময় জীবন ফিরে পাবো ।

- এখানে এলে ভাবির হাতের মুড়িঘন্টও খাওয়া যাবে ঘন-ঘন -

বলেই দু' বন্ধু মিলে ক্ষানিকক্ষন হাসলো । হঠাৎ স্মৃতি তাড়িত হয়ে নিলয় বলে উঠলো ' নিরব হোটেলের খাওয়ার কথা মনে আছে - দোস্ত ? চানখার পুলের রেস্তোরায় ও তো কতদিন খেয়েছি , বিয়ে করে এবার সংসারি হ' রে . . . নিজের বৌ এর হাতের রান্না আরও সু-স্বাদু লাগবে । '

৯)

নেত্রকোনা সরকারী কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান মঞ্জুরুল হাসান মঞ্জু গুরুদয়াল সরকারী কলেজে বদলী হয়ে এসেছেন এ বিষয়টি কেন যে এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা রিক্তা । কলেজের প্রিন্সিপালকে যেন চেনাই দায় ; রীতিমত খয়ের খাঁ হয়ে উঠেছেন ঐ নতুন প্রফেসরের ।

প্রথমদিন সকালেই বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে ডাক পড়লো রিক্তার । টেবিলের অপর পার্শ্বে মাথা নত করে বসে থাকা রিক্তার দিকে চেয়ে মঞ্জু শুধু একটি প্রশ্ন-ই করলো :
‘ আপনার মা কেমন আছেন ? ’

খুব অবাক হ'লো রিক্তা । বুঝে উঠতে পারছিলনা লোকটি কে । মা'র কথা জিজ্ঞেস করলো কেন ? ‘ জী ভাল ।’ ছোট্ট করে উত্তরটা দিয়েই আবার নিরব হ'লো সে । ইতঃস্তত করতে থাকা রিক্তাকে বিব্রত হওয়ার হাত থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে মঞ্জু বল্ল , ‘ এখন থেকে বিভাগীয় সকল সমস্যাকে আমরা খুব আপন করে নেব ; আর আমরা দু'জন দু'জনার খুব ভাল বন্ধু হ'বো - রাজী ? ’ প্রথম দিনেই এতটা সহজ হওয়ার আহ্বান ! এবার একটু বেশি মাত্রায়ই অবাক হ'লো রিক্তা । তবুও সপ্রতিভ হাসি ছড়িয়ে উত্তর দিলো , ‘ নিশ্চই স্যার ।’

- উহু , স্যার নয় । আমার নাম মঞ্জু । আমাকে মঞ্জু বলেই ডাকবেন ।

- কিন্তু স্যার . . .

- কোন কিন্তু নয় । আপনি আজ থেকে ‘তুমি’ আর আমাকেও ‘তুমি’ সম্বোধনেই ডাকবেন ।

এবার রিক্তা মাথাটা ঈষৎ তুলে তির্যক চোখে তাকালো মঞ্জুর চোখে । রিক্তার চোখের তারায় স্থীর দৃষ্টি রেখে মঞ্জুর চোখ দু'টো হেসে উঠলো এক অপূর্ব রহস্য ঘেরা কৌতুক মাধুর্য্যে । আচমকা ভ্যাবাচেকা খেয়েও রিক্তা নিজেকে সামলে নিয়ে বল্ল , ‘ চেষ্টা করবো . . . ’

এলো-খোপার কিছু খোলা চুল ডান কানের পেছনে ঠেলে দিয়ে মাথাটা ডান পাশে কাত করে লজ্জাবণত রিক্তা জড়তা মাখা চলার গতিতে মঞ্জুর রুম থেকে বেরিয়ে এলো ।

১০)

মহিলা স্টাফ রুমে ঢুকে দরজার নীল পর্দাটা টেনে দিয়ে টেবিলের উপড় মাথা রেখে হাঁপাতে লাগলো রিক্তা । কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা ! চোখের পলক নেই না কি লোকটার ? অমন সুন্দর চোখে এরকম অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলে মানুষ মারা যাবেনা ? আশ্চর্য্য ! ওভাবে এতক্ষন কেউ তাকিয়ে থাকে ? মনে -মনে ভাবতে-ভাবতে রুমের সাদা বেসিন সংলগ্ন আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায় রিক্তা । ই . .মা ! গাল , নাকের ডগা , থুতনী সব যে লাল

হয়ে গেছে তার ! এখন এ অবস্থায় তার ক্লাশ নেয়া অসম্ভব । প্রিন্সিপালকে বলে দুত বাসায় চলে এলো । বাসায় ঢুকে তালা খুলেই সোজা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লো বালিশে । সমস্ত গায়ে কি ভিষণরকম কাঁপুণি ! জ্বর -টর আসবে না কি কে জানে , কি অঘটন টাই না ঘটে গেল আজ , সর্বনাশ !

এক টানে খোপাটা খুলে এলো চুলের ফাঁকে-ফাঁকে আঙুল চালিয়ে মাথায় বিনুণী কেটে আজকের দৃশ্যটি বার-বার , বার-বার করে ভাবতে লাগলো রিক্তা । যতই ভাবছে ততই ভাল লাগছে । যেন শেষ নেই এর । ভাল লাগার রিনি-রিনি সুর ছড়িয়ে পড়ছে তার দেহ-মনের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে । কলেজের আর সব পুরুষ শিক্ষকদের চেয়ে এই শিক্ষকটি বেশ সুদর্শন আর দির্ঘাঙ্গী রিক্তার পাশে অন্যান্য পুরুষ শিক্ষকদের তো বামন মনে হয় । কিন্তু আজ সে এ কোন সু-পুরুষের দেখা পেলো ! তার ব্যাক্তিত্ব , কথা বলার ঢং , বুদ্ধিমত্তা , মানুষকে জয় করার ক্ষমতা সব মিলিয়ে দারুণ এক মানুষ মনে হলো মঞ্জুকে ।

অন্যদিন দুপুরে বাড়ি ফিরেই গোসল সেরে ভাত চড়ায় , আজ আর কোন কাজ করার অবস্থা নেই তার । কিছু না খেয়েই জোর করে চোখ চেপে কিছুক্ষন পড়ে থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো রিক্তা ।

সমিতি থেকে বিকেলে বাড়ি ফিরে রাণু দেখে, রিক্তা ঘুমুচ্ছে । দরজা হা করে মেলে রাখা । ছিটকিনি আটকাতেও ভুলে গেছে । এমনকি গেইট টাও আজ খোলা পেয়েছে রাণু । রান্না ও করা নেই ঘরে । খুব অবাক হ'লো রাণু ।

- কি রে , জ্বর হ'লো না কি ?

- হ্যাঁ মা । নাহ্ ! মানে , জ্বর না । এমনি ।

মা'র সামনে সহজ হতে পারছেনা রিক্তা । এর পর অনেক প্রশ্নই করলো রাণু । রিক্তা তার উত্তর দিতে পারলোনা । শুনতেই পেলোনা যেন । ঘুমে আবার চোখ বু'জে এলো তার । রাণু রিক্তার দিকে তাকিয়ে ভাবলো , মেয়েটির আজ হ'লো কি ?

কলপাড়ে চাল ধুঁয়ে ভাত বসিয়ে দিলো রাণু । আর ভাতের চালের সাথেই দু'টো বড় আলু ধুঁয়ে সেদ্ধ বসিয়ে দিলো । আজ মা মেয়ে মিলে আলু ভর্ত্তা -ভাত খেয়ে নিলেই হবে । সব দিন রান্নার ধৈর্য্য থাকে ও না সবার ।

১১)

পরদিন কলেজে যেতে বেশ কিছুটা সময় দেরী হ'লো । বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলোনা । এক অনিবর্চনীয় সুখ ছিলো সমগ্র ভাবনা জুড়ে । আজ তার চোখে চোখ রাখলে কেমন হবে এটা ভাবতেই রক্তিম হ'লো রিক্তা তাজা গোলাপের মত । মা . . গো ! ঐ চোখে চোখ রাখতে পারবেনা সে । কক্ষনই না । রিক্তার ৩৪ বছর জীবনে কোন পুরুষ-ই তার হৃদয়ে এমন

আলোড়ন তুলতে পারেনি । রিক্সায় বসে রিক্তা ভাবছে , তবে কি আমি প্রেমে পড়লাম ? কথাটা ভেবেই নিজের বাম গালটা বা'হাতের তালুতে চেপে ধরে উষ্ণতা পরখ করলো । কান দু'টো ও গরম হয়ে উঠলো তার । কম্পিত নিম্নোষ্ঠ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেকে সংবরন করে চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিয়ে স্বগতোক্তি করলো , ' দেখা যাক মশাইয়ের অবস্থাটা আজ কেমন ! '

১২)

কলেজের মূল ভবনে ঢুকে হাজিরা খাতায় সই করেই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো রিক্তা । করিডোর পাড় হয়ে ইংরেজী বিভাগের দিকে পা বাড়াতেই জটলাটা চোখে পরলো । প্রফেসর মঞ্জুকে ঘিরে এক গাদা ছাত্রের ভীড় । কৌতূহল নিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই কানে এল কিছু অশ্লীল শব্দ আর আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত কিছু উত্তপ্ত কথা , ' স্যার , আফনের বাবারে কইবাইন যেন তৈরী থাহে । হাড্ডি গুঁড়া-গুঁড়া কইরা লাইবাম তাইনের । হালায় রাজাকার !!!'

চমকে উঠলো রিক্তা । ছেলেগুলো এসব কি বলছে ? কে ? কে রাজাকার ? আরও কিছু সময় পর রিক্তা বুঝে গেল মঞ্জুরুল হাসান মঞ্জু একজন রাজাকারের সন্তান । হৃদয় উপড়ানো কষ্ট হ'তে লাগলো যেন । কোথায় তার শেকড় ? কেন এ স্বল্প পরিচয়ে পরিচিত মানুষটির জন্য তার এত মায়া কাজ করছে ? কেন ?

মঞ্জুকে দেখা গেল অত্যন্ত ধৈর্য্য আর ভদ্রতার সাথে ছেলেগুলোকে বুঝাচ্ছে । মঞ্জু তাদের জানালো যে সে নিজেও রাজাকারদের ঘৃণা করে । তবে এই রাজাকার নিধন-ই স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্য নয় । রাজাকাররা যে অন্যায় করেছে তা তো করেছেই , তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করেই মুক্তিযোদ্ধা আর আপামর জনগণ ছিনিয়ে এনেছে দেশের সার্বভৌমত্ব । আজ দেশে নৈরাজ্য বিস্তারের কারন আমাদের নিজেদের মাঝে অনৈক্য , সহনশীলতার অভাব আর সহিংসতা । এর জন্য শুধু রাজাকারদের দায়ী করে কি চলছে ? না কি চলবে ? আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস , সহমর্মীতা ইত্যাদি মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে তুল্লে রাজাকার কেন ; কোন পরাশক্তিই পারবেনা দেশের কোনও ক্ষতি করতে । মঞ্জু ওদের একটানা বুঝিয়েই যাচ্ছে , তাদের কেউ কেউ মন দিয়ে শুনছে , কেউবা একগুয়েপোনা করে তর্ক করেই যাচ্ছে , কিন্তু মঞ্জু হারাচ্ছেনা তার ধৈর্য্য । চমৎকার এ ব্যাক্তিত্বকে যাচাই করছে রিক্তা করিডোরে পায়চারী করে করে । একটার পর একটা প্রশ্ন হানা দিচ্ছে তার মনে - দেশের কাছে প্রশ্ন , দেশের মানুষের কাছে প্রশ্ন , প্রশ্ন প্রিয় স্বাধীনতার কাছে ; রাজাকারের সন্তান হলেও যে মানুষটি দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনও ভূমিকা রাখেনি , যার ব্যাক্তিত্ব স্বদেশ প্রেমে উজ্জিবীত , সে মানুষটি নিছক জন্মসূত্রের কারনে কি তার প্রিয় স্বদেশে আজীবন 'রাজাকারের বাচ্চা গালাগাল খেয়েই যাবে ? '

জন্মের পর থেকে যে রাজাকার আর পাক হানাদার বাহিনীর লোকদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে পাড় হয়ে এসেছে এতখানি সময়ের সাঁকো পথ , আজ কেমন করে সে সাঁকো গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে মনের আবেগ ? এক বাঁশে গড়া সেই সাঁকো - তার মা রাণু ; যার তিল-তিল কষ্টে গড়েছে রিক্তার দেহের প্রতিটি কণা , যার নি:সঙ্গ জীবনের হাহাকার ঘুচাতে রিক্তার মন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ , আজ তবে কেন সব কিছু ছাপিয়ে ক্ষমার কোমলতা কড়া নাড়ছে রিক্তার নারী হৃদয়ের কপাটে? রিক্তা কি তাহলে হেরে যাচ্ছে তার প্রতিজ্ঞার কাছে ? কেন বার-বার তাও রাজাকারের সন্তান

মঞ্জুকে তার মন ক্ষমা করে দিচ্ছে ? শুন্যে হাত বাড়িয়ে জড়াতে চাইছে মঞ্জুর সুঠাম দেহ । বিড়-বিড় করে বলে উঠছে - 'তুমি আমার , শুধুই আমার মঞ্জু । আর কারও নও । নও এমনকি দেশেরও ।'

ভালবেসে এমন দুর্বল মনের পরিচয় দেবে কি করে সে ? মঞ্জুর সাথে ঘর বাঁধলে কি রিক্তার একবারও মনে হবে না তার মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে সে হেরে গেলো ? হেরে গেলো প্রিয় দেশটার কাছে ? কিন্তু যে মানুষটি তার স্ব-গুনের ছোঁয়ায় রিক্তার মনে লুক্কায়িত কুঁড়িটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে এক আনন্দময়ী হাস্যজ্জ্বল গোলাপে , ঠিক এই মুহুর্ত থেকে যাকে ছাড়া এক মুহুর্তও কল্পনা করতে পারছেনা রিক্তা - তার অবস্থানটা কোথায় হবে ?

সঞ্চারিণী
দাম্মাম, সৌদিআরব
ই-মেইল : Soncharini@gmail.com